ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1447-1460
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.151

উপনিষদীয় অধিবিদ্যার আলোকে আত্মা সম্পর্কে বাউল ধারণা: একটি তুলনামূলক দার্শনিক অনুসন্ধান

ড. তাপস দাস, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 02.07.2025; Accepted: 07.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper presents a comparative philosophical inquiry into the conception of the self (Ātman) as it appears in two distinct yet resonant Indian traditions: the metaphysical thought of the Upanishads and the embodied mysticism of the Baul tradition. In the Upanishadic corpus, the self is conceived as eternal, conscious (cit), and non-different from Brahman—the ultimate, unchanging reality. Liberation (mokṣa) is attained through the realization of this fundamental identity, expressed in mahāvākyas such as "tat tvam asi" and "aham brahmāsmi." The Upanishadic path is marked by contemplative introspection, renunciation, and transcendental knowledge (jñāna).

In contrast, Baul philosophy locates the divine within the human body (dehatattva) and emphasizes inner experiential realization through love (prema), song, and embodied sādhanā. The Baul dictum "dehe ache Brahma" ("Brahman resides in the body") reflects an immanentist ontology where the self is not merely a metaphysical abstraction but a living, experiential presence. The Baul path affirms that the microcosm (the body) mirrors the macrocosm (the universe), revealing a non-dualistic vision akin to that of the Upanishads, though arrived at through radically different epistemic means.

This comparative study demonstrates that while the Upanishads emphasize a transcendental, knowledge-based path to self-realization, and the Bauls follow a path of love and experiential embodiment, both converge in their affirmation of the self as the site of the absolute. The dialogical juxtaposition of these traditions offers a broader philosophical framework for understanding the plurality of Indian approaches to the self, liberation, and the nature of ultimate reality.

Keywords: Ātman, Brahman, Upanishads, Baul philosophy, mokṣa, jñāna, prema-sādhana, dehatattva, Indian metaphysics, comparative philosophy

এই প্রবন্ধে আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে উপনিষদ এবং বাউল দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, 'আত্মতত্ত্ব' ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক অনুষঙ্গ। 'আমি কে?'- এই প্রশ্নকে ঘিরে আত্মানুসন্ধানে যে তাত্ত্বিক চর্চা; তা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় মননে ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়েছে। এখানে আত্মস্বরূপ, পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে মুক্তি- প্রভৃতি বিষয়গুলি দর্শনগত বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে, বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক বাউল দর্শনে 'আত্মতত্ত্ব' অভিজ্ঞতালব্ধ, জীবনঘনিষ্ঠ ও দেহমুখী অনুসন্ধান হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। অর্থাৎ বাউল দর্শনে আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে মানবদেহকেন্দ্রিক ঈশ্বর-অনুসন্ধানের মাধ্যমে। বাউলগণ "দেহই ব্রহ্ম" ও "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে"- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে

আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হন। তাই দর্শন চর্চায় এই দুটি ধারা- একদিকে ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বজগৎ, অপরদিকে প্রান্তিক গ্রামীণ সাধনার প্রবাহ- যেমন বিমূর্ত জ্ঞান ও প্রেমভিত্তিক বোধকে কেন্দ্র করে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির দুটি ভিন্ন পথ; তেমনি আবার শেষ বিচারে এই দুটি তত্ত্বই আত্মদর্শন বা আত্মউপলব্ধির পথ, যার একটি জ্ঞানমার্গ এবং অপরটি প্রেম ও সাধনামার্গ। তাই একদিক থেকে এই প্রবন্ধ যেমন ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা অনুধাবনে সহায়তা করে, তেমনি অপর দিক থেকে তা সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বহুত্বতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এখন প্রশ্ন- এই বৈচিত্রতা এই প্রবন্ধে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে? যার উত্তরে পরবর্তী অংশে গবেষণার উদ্দেশ্য ও কৌশল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও কৌশল:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল, উপনিষদে এবং বাউল সঙ্গীতে উপস্থাপিত আত্মতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এবং এক্ষেত্রে যে দুটি প্রশ্ন অনুসরণে এই গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে তাই হল-

- আত্মতত্ত্ব কীভাবে উপনিষদীয় দার্শনিক পরিসরে ব্যাখ্যাত হয়েছে?
- আত্মার অভিজ্ঞতাকে বাউলগণ কীভাবে দেহ সাধনা ও সংগীত-সাধনার মধ্যদিয়ে ব্যক্ত করেছেন? এবং এই প্রকাশে কি কোনোভাবে উপনিষদীয় দর্শনের প্রভাব পড়েছে?

আর এই দুটি উদ্দেশ্য পূরণে গবেষণাটি যে তিনটি স্তরে সম্পাদিত হয়েছে তাই নিম্নরূপ-

১. **তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:** উপনিষদীয় দর্শনের প্রধান উপাখ্যান ও মহাবাক্যের দর্শনচিন্তার ব্যাখ্যা।
২. **লোকজ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ:** বাউল গানের ভাষা, সাধনাপদ্ধতি ও দেহতত্ত্বের আলোকে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান।
৩. **তুলনামূলক অধ্যয়ন:** উপনিষদ ও বাউল দর্শনের পন্থা, দর্শনগত অবস্থান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য— এই তিনটি দিক বিশ্লেষণ করে এক সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন।

গবেষণাপদ্ধতি হিসেবে এখানে গ্রন্থ পর্যালোচনা, দর্শনচিন্তা ও বিশ্লেষণাত্মক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় ধারার মৌলিক ও গৌণ পাঠ্যসূত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠ ও চেতনার সংলাপ স্থাপন করা হয়েছে। এবার মূল পর্বের আলোচনায় আসা যাক। এক্ষেত্রে প্রথমে আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হবে।

উপনিষদীয় তত্ত্বালোকে স্বরূপের অনুসন্ধান:

উপনিষদে জীবাত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে উল্লেখিত আখ্যানের দর্শনগত তাৎপর্য অনুধাবন এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত, পরমাত্মার সন্ধানে বৈদিক সাহিত্যে জীবাত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান প্রাথমিক সোপান রূপে স্বীকৃত। এখানে যে প্রশ্নটি মূল আলোচ্য বিষয় তাহল- ব্রহ্ম স্বরূপত কীরূপ? এবং জীব ও জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক কিরূপ? যার মধ্যে প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যদিয়ে 'ব্যক্তিক অভিন্নতা' প্রসঙ্গে প্রাচীন উপনিষদীয় চিন্তাধারার একটা বর্ণনা খুঁজে পাই। যেখানে দাবী করা হয়েছে, পারমার্থিক বিচারে ব্রহ্ম শুদ্ধ চেতন সত্তা এবং জীবাত্মা স্বরূপত ব্রহ্ম। অর্থাৎ বৈদিক বিচারে জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা বর্ণনায় এখানে ৪টি মহাবাক্যের সন্ধান মেলে, যথা- ঋগবেদে বলা হয়েছে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', সামবেদে বলা হয়েছে 'তত্ত্বমসি', যজুর্বেদে বলা হয়েছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং অথর্ববেদে বলা হয়েছে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। যার নির্যাস কিন্তু এক, 'জীব তুমি সেই ব্রহ্ম'। এখন প্রশ্ন- বৈদিক সাহিত্যানুসারে আমি কে? বা আমার স্বরূপ কী? উক্ত প্রশ্নোত্তরে উপনিষদ বর্ণিত কিছু আখ্যান যথা (১) আরুণি-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান, (২) নচিকেতা ও যমরাজের উপাখ্যান এবং (৩) যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান- এই তিনটি আখ্যানের বিচারসহ উল্লেখ করে আমরা উপনিষদ বর্ণিত 'ব্যক্তি'-র স্বরূপ উদঘাটন করতে চেষ্টা করব।

প্রসঙ্গত চেতনার অস্তিত্ব নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য না থাকলেও তার আধার নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য সর্বদাই বিদ্যমান। একদল দার্শনিকগণ চেতনাকে দেহের গুণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। ফলত তাঁরা চেতনার আধার হিসাবে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেননি। পক্ষান্তরে আরেকদল দার্শনিকদের মতে চেতনা কোনোভাবেই দেহের গুণ নয়। তাঁরা চেতনার আধার স্বরূপ দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আর এই স্বতন্ত্র সত্তাকেই ভারতীয় দর্শনে আত্মা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন- ব্যক্তিক অভিন্নতার আলোচনায় স্বরূপের মানদণ্ড কোনটি? চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ? নাকি দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা তথা আত্মা? উক্ত প্রশ্নে চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয়

দার্শনিকগণ দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা স্বরূপ আত্মাকে স্বরূপের মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করলেও চার্বাকগণ তা অস্বীকার করেন। এমতে 'আমি' এবং 'আমার দেহ' বাক্য দুটি যেহেতু অভিন্ন অর্থের বোধক তাই চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই ব্যক্তিক অভিন্নতার একমাত্র মানদণ্ড। চার্বাকদের এরূপ মতবাদ ভারতীয় দর্শনে নানা ভাবে সমালোচিত হয়েছে। অধ্যাত্মবাদীগণ এমতের সমালোচনা করে বলেন, দেহকে স্বরূপের মানদণ্ড বলে স্বীকার করলে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া দেহ উৎপত্তি বিনাশযোগ্য হওয়ায় তা অনিত্য। কাজেই অনিত্য দেহ কখনোই স্বরূপের পরিচায়ক নয়। ফলত এখানে দেহাতিরিক্ত চেতনার আধার স্বরূপ আত্মাকে স্বরূপের মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করা হয়। এখন প্রশ্ন অধ্যাত্মবাদীগণ কেন স্বরূপের মানদণ্ড হিসেবে আত্মাকে স্বীকার করেন? উক্ত প্রশ্নোত্তরে এখানে প্রথমে ছান্দোগ্যোপনিষদ আলোচিত আরুণি ও শ্বেতকেতুর কথাপোকথনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ -

আরুণি ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যান:

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরুণি ও তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর মধ্যেকার বাক্যালাপ থেকে যেমন এটা প্রমাণিত হয়, জীব স্বরূপতই ব্রহ্মা স্বরূপ; তেমনি এটাও প্রতিষ্ঠা হয় যে, এখানে 'আমি' বলতে দেহ নয়, দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকৃত হয়েছে। যে কি'না শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য শাশ্বত অপরিবর্তনশীল সত্তা। এবং বিষয় স্বরূপ সেই একমাত্র সত্য, তাই তাকে জানতে পারলে তা থেকে উৎপন্ন সকল বিকার আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তিক অভিন্নতা বলতে আত্মগত দিকদিয়ে অভিন্ন আত্মার অধিকারীকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দাবী করা হয়েছে বাহ্য জগতে আমি, তুমি, সে এই ধরণের শব্দ ব্যবহার ও তাকে কেন্দ্র করে যে 'অপরের সমস্যা' (অপরের স্বরূপকে কিভাবে জানা যাবে?), তা নেহাতই ব্যবহারিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যেহেতু জীবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই; সকলেই এক এবং অভিন্ন চেতন স্বরূপ, তাই অপরের সমস্যা বলে আদতে কিছু নেই। নিজের স্বরূপকে জানা মানেই অপরকে জানা, এক জ্ঞানের মধ্যদিয়ে আমাদের সর্বজ্ঞান লাভ হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে ব্যক্তি ও জীব কিভাবে অভিন্ন? কিভাবেই বা জীব শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ? এবং কিভাবেই বা নিজের স্বরূপ জ্ঞানের মধ্যদিয়ে অপরের জ্ঞান লাভ সম্ভব? উক্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের শ্বেতকেতু ও আরুণির উপাখ্যানটি বিশদে আলোচনা করতে হয়।

কথিত আছে, আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যাতে পারদর্শী হবার জন্য গুরুগৃহে পাঠান। শ্বেতকেতু ১২ বছর গুরুগৃহে বসবাস করে সমস্ত বেদ অধ্যায়ন করে, গম্ভীর চিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনতী স্বভাবী হয়ে ফিরে আসেন। পুত্র ফিরে আসলে পিতা যাচাই করে দেখতে চান, তাঁর সন্তান পরমসত্তার জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছে কি না। এক্ষেত্রে সে তাঁর সন্তানকে প্রশ্ন করেন- তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, যাতে অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়? পিতার প্রশ্নে পুত্র শ্বেতকেতু বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং জানতে চায় কি সেই উপদেশ? যে উপদেশে এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞানের জ্ঞান হয়। পুত্রের কৌতুহল নিবারণে আরুণি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিন্ডকে জানলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তুকে জানা যায়।[৮] যেমন একটি সূবর্ণ পিন্ডের দ্বারা সুবর্ণের পরিনামভূত সমস্ত বিষয় জানা যায়, যেমন একটি লৌহপিন্ডের দ্বারা পরিনামভূত সমস্ত বিষয় জানা যেতে পারে।[৯] এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে, একটি মৃত্তিকা থেকে সমগ্র মৃত্তিকার পরিনামভূত বিষয়ের জ্ঞান লাভ কিভাবে সম্ভব? কিভাবেই বা একটি লৌহখন্ডের জ্ঞানের দ্বারা তা থেকে উদ্ভূত সকল বিষয়াদির জ্ঞান লাভ সম্ভব? তার উত্তরও কিন্তু আরুণি উক্ত শ্লোকেই দিয়েছেন। আরুণির মতে কেবলমাত্র বিষয় সত্য, এবং বিষয়ের বিকার হল বাক্যের অবলম্বন মাত্র তথা নাম। তা যেহেতু সত্য নয়, তাই বিষয়কে জানতে পারলে তা থেকে উৎপন্ন সকল বিকারের জ্ঞান আমাদের হয়ে যায়। উক্ত দৃষ্টান্তে মৃত্তিকা পিন্ড হল বিষয় এবং তার বিকার স্বরূপ আমরা মৃত্তিকা নির্মিত ঘট, থালা, গ্লাস ইত্যাদি মৃন্ময় বস্তু স্বীকার করতে পারি। তাই আরুণির মতে কেবল মৃত্তিকা সত্য এবং মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত বা মৃত্তিকার বিকার স্বরূপ সকল কিছুর জ্ঞান যেহেতু মৃত্তিকার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু মৃত্তিকার জ্ঞান হলে সকল মৃন্ময় বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান আমাদের হয়ে যায়। এর জন্য পৃথক পৃথক মৃন্ময় বস্তুকে জানার কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন আসতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাৎপর্য কি? উত্তরে বলা যায়, বেদান্ত মতে যেহেতু অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা; সেহেতু এখানে বিষয়ের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে দাবী করা হয়েছে, কেবলমাত্র বিষয় হল সত্য। আর বিষয় থেকে যা উৎপন্ন হয় তাই হল বিষয়ের 'বিকার'। ব্যবহারিক দিক থেকে বিকার 'সত্য' হলেও পারমার্থিক বিচারে কেবলমাত্র বিষয় হল 'সত্য'। অতএব 'ব্যক্তিক অভিন্নতা' উপলব্ধি করতে হলে বিকার স্বরূপ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিদ্যমান ভেদ অতিক্রম করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা। এই

প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খন্ডের সপ্তম সূত্রে বলা হয়েছে, 'এই যে সুক্ষ্মতম বস্তু, তাই হল সমস্ত জগতের আত্মা। তিনি সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি' (৬/৮/৭)।[১০] এই অংশে আরুণি শ্বেতকেতুকে পরমাত্মার সাথে অভিন্ন বলে বর্ণনা করায় শ্বেতকতু বিষয়টি পুনরায় ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করেন। শ্বেতকেতুর অনুরোধে আরুণি জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা বর্ণনায় একাধিক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছেন, যার উল্লেখ নবম থেকে ষোড়শ খন্ড পর্যন্ত আছে। যেমন নবম খন্ডে আরুণি, মৌচাক ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে 'তৎত্বমসি' মহাবাক্য ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে শ্বেতকেতুর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মৌমাছি বিভিন্ন ফুল, ফল থেকে রস সংগ্রহ করে মৌচাক বাঁধে। কিন্তু তাতে থাকা মধুর বিন্দুতে যেমন কোনো ভেদ থাকেনা (কোন গাছের রস হতে মধুর কোন বিন্দুর সৃষ্টি তা বোঝা যায় না), তেমনি প্রারম্ভে বা অন্তিমে জীবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জীব হল শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। আবার ত্রয়োদশ খন্ডে ব্রহ্মের অভিন্নতা বর্ণনায় লবনাক্ত জলের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শ্বেতকেতুকে জলপূর্ণ একটি পাত্রে এক খন্ড লবন রেখে দিতে বলেন এবং বলেন আগামি কাল তাকে সব বুঝিয়ে বলবেন। পরেরদিন যথা সময় শ্বেতকেতু উপস্থিত হলে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে জলপূর্ণ পাত্র থেকে লবন খন্ডটি তুলে আনতে বলেন। কিন্তু শ্বেতকেতুর পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, কারণ লবন জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই মত অবস্থায় উদ্দালক বলেন জলে নিক্ষিপ্ত লবন যেভাবে জলে বিলীন হয়ে আছে, ঠিক সেভাবেই ব্রহ্মও বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সব কিছুতেই বিলীন হয়ে আছে। তাই আমি, তুমি এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কাজেই যদি স্ব-রূপকে জানতে হয়, তাহলে শুদ্ধ চেতনের জ্ঞান লাভ আবশ্যিক। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে জীবের স্বরূপের মানদণ্ড হিসেবে দেহাতিরিক্ত শুদ্ধ চেতন সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই এই বিচারে 'আমার দেহ' কখনই 'আমি' নয়। 'দেহ' হল উপাধি এবং দেহরূপ উপাধীতে উপহিত আত্ম চৈতনাই হল আমার 'আমিত্ব' বা 'অহম'। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পাই নচিকেতা ও যমরাজের উপাখ্যানে।

নচিকেতা ও যমরাজের উপাখ্যান:

বৈদিক সাহিত্য ব্যাখ্যাত 'আত্মপরিচয়' মূলক আলোচনায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে কঠোউপনিষদ্ বর্ণিত নচিকেতা ও যমরাজের কথাপোকথনকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নচিকেতা ও যমরাজের কথাপোকথনের মধ্যদিয়ে মূলতঃ মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুতেই কি ব্যক্তির বিনাশ ঘটে? না কি মৃত্যু পরবর্তীতেও তার ব্যক্তিত্ব অবিনশ্বর থাকে, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আসলে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না? এই প্রশ্ন যেমন সাধারণ মানুষের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে, তেমনি তা ঋষি মুনিদের চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত করে মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে চেয়েছে। ফলত আত্মার স্বরূপের ব্যাখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে একাধিক মতবাদ। যার মধ্যে অন্যতম একটি অধ্যাত্মবাদ। আর এই অধ্যত্মবাদী আত্ম তত্ত্বের বর্ণনাই আমরা পাই এই উপাখ্যানে। এখানে বলা হয়েছে বাজশ্রবস মুনির নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। একদা বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছিলেন এবং যজ্ঞ ফলাকাঙ্খায় সে যথাসর্বস্ব দান করবে বলে সংকল্প করেছিলেন। যদিও যেরূপ সংকল্প সে করেছিলেন, তেমনটি দান না করায় বালক নচিকেতা পিতাকে প্রশ্ন করেন- পিতা আপনি আমাকে কাকে দান করলেন? নচিকেতার প্রশ্নের কোনো উত্তর বাজশ্রবস দেয়না। ফলত নচিকেতা একাধিকবার তাঁর পিতাকে উদ্দেশ্য করে এই প্রশ্নটি করেন যে, তিনি তাকে কাকে দান করলেন? একসময় পুত্রের প্রশ্নে অতিষ্ট হয়ে বাজশ্রবস বলেন 'তোমায় যমকে দান করলাম'। পিতা অভিমান করে এই কথা বললেও বালক নচিকেতা তা সত্য বলে ধরে নেয় এবং সে যমের কি কাজে আসতে পারে এই চিন্তা করে যম পুরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রস্তুতি নেয়। নচিকেতা যখন যম পুরিতে এসে পৌছায় তখন যমরাজ ছিলেন না। তাই তাকে যমপুরির আথিতেয়তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু বালক নচিকেতা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং যমরাজের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেন। এই ভাবে তিনদিন অতিবাহিত হবার পর যমরাজ যখন যমপুরিতে এসে শোনেন এক ব্রাহ্মণ বালক তার অপেক্ষায় তিনদিন প্রতিক্ষারত এবং সে কোনো প্রকার আথিতেয়তা গ্রহণ করেনি, তখন পাপের আশঙ্কা থেকে যমরাজ নচিকেতাকে তিনদিনের আথিতেয়তার জন্য তিনটি বর প্রার্থণা করতে বলেন। যমরাজের কথা মত নচিকেতা তিনটি বরের কথা বলেন, এই ক্ষেত্রে যমরাজ প্রথম ও দ্বিতীয় বর পূরণ করলেও তৃতীয় বরের আকাঙ্খা মানতে অস্বীকার করেন এবং এর পরিবর্তে অনাকিছু চাইতে বলেন। যদিও নচিকেতা যমরাজের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং অনুনয়ের সাথে তৃতীয় বর হিসাবে বারং বার একই মনবাসনার কথা ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে- নচিকেতা তৃতীয় বর হিসাবে এমন কি চান যা স্বয়ং মৃত্যুদেবও দিতে অস্বীকার করেন? উত্তরে বলি, আসলে তৃতীয় বর হিসাবে নচিকেতা মৃত্যু-রহস্যের সমাধান জানতে চেয়েছিল যমরাজের কাছে; তাই

যমরাজ তা দিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে- কেন যমরাজ নচিকেতাকে মৃত্যু রহস্যের সমাধান বলতে চায়নি? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের যমরাজ ও নচিকেতার কথাপোকথন আলোচনা করতে হয়।

তৃতীয় বর হিসাবে নচিকেতা বলেন, অনেকের বিশ্বাস মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মার অবলুপ্তি হয়, আবার কেউ কেউ বলেন মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ হয় না। এর মধ্যে কোনটি সত্য সেটাই আমি জানতে চাই।[১১] বালক নচিকেতার এই প্রশ্নের মধ্যদিয়ে কিন্তু সেই বহুল চর্চিত বিষয়েরই অনুসন্ধান করা হচ্ছে- আত্মা নিত্য? না কি অনিত্য? কারণ, আত্মা যদি অনিত্য হয় তাহলে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার সম্ভব নয়। কাজেই তখন 'আমার দেহ'কেই আমার স্বরূপ বলে স্বীকার করতে হয়। অপরদিকে যদি আত্মা নিত্য হয়, তাহলে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য এবং 'আমার স্বরূপ' বলতে 'নিত্য আত্মার' স্বরূপ জ্ঞানকেই স্বীকার করতে হয়। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলেন "এই ব্যাপারে স্বয়ং দেবতাদেরও আগে সংশয় ছিল। এই ধর্মের তত্ত্ব এত সূক্ষ্ম যে তা সহজে বোঝা যায় না, তাই তুমি অন্য বর চাও।"[১২] কিন্তু বালক নচিকেতা এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তৃতীয় বর হিসাবে তাঁর আত্মজ্ঞানই চাই। সে পুনরায় যমরাজকে অনুরোধ করে বলেন এই বিষয়ে আপনার থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেউ নেই, তাই এই বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন।[১৩] যদিও যমরাজ তাতে অসম্মত হন এবং নচিকেতাকে ইচ্ছামত পার্থিব সুখ সম্পদ কামনা করার উপদেশ দেন। কিন্তু দুর্দমনীয় বালক নচিকেতা নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে যমরাজকে বলেন পার্থিব সকল সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী। তাই ক্ষণস্থায়ী বিষয় সুখে তার কোনো আগ্রহ নেই। তার আগ্রহের বিষয় কেবলমাত্র মৃত্যু রহস্যকে জানা; মৃত্যুতে কি আত্মা ধ্বংস হয়? না কি তা অবিনশ্বর থাকে? তা জানাই তার অভিপ্রায়।[১৪]

নচিকেতার এই দৃঢ় মনোভাব যমরাজকে অভিভূত করে এবং তৃতীয় বর স্বরূপ আত্মতত্ত্ব রহস্যকে উদঘাটন করেন। তিনি বলেন জগতের সকল ব্যক্তি 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়' এই দুইটি মার্গে আবদ্ধ। শ্রেয় হল মঙ্গলের পথ, পরম সত্যের পথ। এবং অবশ্যই এই পথ অতিদুর্গম। অপরদিকে 'প্রেয়' হল ক্ষণস্থায়ী সুখ লাভের পথ, এই পথ সহজসাধ্য। তাই বেশিরভাগ মানুষ এই পথে অগ্রসর হয় এবং পরমসত্য জ্ঞান লাভ হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই শ্রেয়মার্গ অবলম্বন করেন। এর দ্বারা চিরস্থায়ী আনন্দ ও শান্তি লাভ সম্ভব হয়। অর্থাৎ শ্রেয় এবং প্রেয়মার্গ পরস্পর বিরোধী, প্রেয়মার্গ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় জনিত সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সুখ আপাত মধুর ও চিত্তাকর্ষ হলেও তা পরম সত্য জ্ঞান লাভে সম্ভব নয়। তাই সত্যজ্ঞান এই পথ অবশ্য পরিত্যাজ।

উল্লেখ্য, এই উপাখ্যানের মধ্যদিয়ে আসলে এটা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, অজ্ঞানী ব্যক্তি দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। তার কাছে তার দেহটি হল তার স্বরূপ। তাই তারা দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা গঠন করতে পারে না এবং জাগতিক বিষয় মোহে আবিষ্ট থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিষয়ে অবগত যে, দেহ আত্মা নয়। আত্মা দেহ হতে স্বতন্ত্র, এবং দেহ ভিন্ন হলেও বিভিন্ন দেহে এক আত্মাই বিরাজমান। দেহ পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং দেহের বিনাশ হলেও আত্মা বর্তমান থাকে। এখন এই প্রেক্ষিত হতে যদি 'ব্যক্তিতত্ত্ব' ও 'ব্যক্তিগত অভিন্নতা'কে যাচাই করি, তাহলে এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে 'আমার দেহ' কোনো ভাবেই 'আমার স্বরূপের পরিচায়ক নয়'। 'আমার স্বরূপ' আদতে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সভার জ্ঞান। বৈদিক চিন্তা-চেতনায় আত্ম-পরিচয় মূলক জ্ঞানের অপর নিদর্শন আমরা পাই যাজ্ঞবল্কা ও মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে, যা তৃতীয় দৃষ্টান্ত রূপে আলোচনা করে হল।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান:

আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনায় এরকমই আরেক দৃষ্টান্ত হল- বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল, মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী। একদা তপস্যার জন্য গৃহত্যাগ করার পূর্বে তিনি মনোস্থির করেন, তাঁর যাবতীয় সম্পদ, তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেবে। এই উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য যখন কাত্যায়নীকে ডাকলেন, তখন কাত্যায়নী ধনসম্পতির ভাগ পেয়ে স্পষ্টতই সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু বাধ সাধে মৈত্রেয়ী। এক্ষেত্রে সে তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন- তাঁর স্বামী তাঁকে যা দিয়ে যাচ্ছেন তাতে কি তিনি অমর হবেন? এক্ষেত্রে সত্যনিষ্ট যাজ্ঞবল্ক্য বিন্দুমাত্র অসত্যের আশ্রয় না নিয়েই প্রত্যুত্তরে বলেন, এর সাথে অমরতার কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। যা শুনে মৈত্রেয়ী বলেন, তার এমন কোনো সম্পদের প্রয়োজন নেই যা তাকে অমরতা প্রদান করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ অমরতা প্রদানে সামর্থ নেই এরূপ সম্পদ মৈত্রেয়ীর কাছে নিরর্থক। ফলতঃ যাজ্ঞবল্ক্য এক্ষেত্রে উপলব্ধি করেন মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারী হওয়ার যোগ্য। কাজেই গৃহত্যাগের পূর্বে তিনি মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন।

এক্ষেত্রে ভালো করে বিচার করলে এটা উপলব্ধি হয়, অমরত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান বিহীন মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে অস্বিকার করার এই যে মানসিকতা, তা স্পষ্টভাবে এটাই ব্যক্ত করে যে অনিত্য দেহ অতিরিক্ত নিত্য, শাশ্বত, অবিনশ্বর, সত্তা অবশ্যই কিছু আছে। আর এই সত্তাই হল 'আমার স্বরূপ'। তাই 'ব্যক্তিক অভিন্নতা' জ্ঞান বলতে এখানে অপরিনামী সত্তার জ্ঞানান্বেষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন উক্ত তিনটি আখ্যান বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে 'ব্যক্তিক অভিন্নতা' প্রসঙ্গে বলা যায়- আত্ম-দর্শনের পথ ধরে শেষে মানুষ জানতে পেরেছে যাঁকে জানলে সবকিছু যানা যায়, তিনি আত্মা। সুতরাং আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল আত্ম-স্বরূপের জ্ঞানার্জন (আত্মানং বিদ্ধি)। আর আত্মা স্বরূপত যেহেতু শুদ্ধ চেতন সত্তা, সেহেতু এর পরিচয় আত্মাই চেতনার অবিচ্ছিন্নতা এবং অহং বোধের মূল। উল্লেখ্য, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যদিও ব্যক্তিত্ব এবং জীবত্ত্ব উভয়ই অহং পরিচয়ের বোধক, কিন্তু উপনিষদীয় চিন্তা-চেতনায় ব্যক্তিত্ব এবং জীবত্ত্ব দুইটি ভিন্ন বিষয়। এমতে মনুষ্য দেহধারী ব্যক্তি যখন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে 'আমার দেহ', 'আমার ঘর', 'আমার স্ত্রী', 'আমার সম্পদ'- এভাবে নিজ পরিচয় দিয়ে থাকে, তখন তা ব্যক্তিত্ত্বের বোধক। এই বিচারে 'ব্যক্তিত্ব বলতে বর্তমান দেহে মনুষ্যরূপ অভিব্যক্তি এবং এই ব্যক্তিত্ত্বের সাথে বিষয়ের যে সম্বন্ধ তাই এখানে ব্যক্ত হয়। কিন্তু আমাদের যে জীবত্ত্ব রূপ তা নিত্য, শাশ্বত, অপরিনামী, সত্তা এবং এর উৎপত্তি বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে। তাই বৈদিক মতে আমাদের দেহরূপ উপাধিতে উপহিত আত্মচৈতন্যই আমার 'আমিত্ব'। 'দেহ' যে আমার স্বরূপ নয় সেকথা গীতাতেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে, ভৌতিক শরীর হল আত্মার পরিধেয় পোষাক।[১৫] আসলে জড়বাদী দর্শনে, যেখানে আমাদের এই স্থূল অনিত্য দেহটাকে 'আমি' বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেখানে অধ্যাত্মবাদ দেহের মধ্যে দেহী আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকে আত্মা রূপে উপলব্ধি করা 'দেহাত্মবাদ' বা 'দেহাত্মবোধ'। বিপরীতক্রমে আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন- এই জ্ঞান হল 'দেহাত্মবিবেক'। আর দেহাত্মবিবেকের জ্ঞান লাভই হল 'স্ব-ভাব'কে জানা। অতএব উপনিষদ্ আলোচিত আত্মতত্ত্বের প্রেক্ষিতে 'ব্যক্তিক অভিন্নতা' প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায়, আত্মপরিচয়ের যথার্থ বোধক হল 'আত্মা' (self)। এবং কালিক আত্মপরিচয় যে গ্রহণযোগ্য নয় তাও এখানে বিষদে আলোচিত হয়েছে। কাজেই যে প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল- আত্মা এবং দেহ কি অভিন্ন? না কি আত্মা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে একাত্মা আছে? এই প্রশ্নে উপনিষদীয় সিদ্ধান্ত হল, আত্মা যেমন দেহের সঙ্গে অভিন্ন নয়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও আত্মার পরিচয় বোধক নয়। অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত অভিন্নতা' সংক্রান্ত প্রশ্নে আত্মা (self) শব্দটির দ্বারা দেহ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় কোনোটির সাথেই এর অভিন্নতাকে বর্ণনা করা হয়নি। বরং আত্মাকে দেহ, জ্ঞানেন্দ্রিয় অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে যদি কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, তাহলেও যেহেতু আত্মপরিচয়ের ধারনার অবলুপ্তি হয় না, সেহেতু এটি অবশ্যই মানতে হয় ব্যক্তির আত্মপরিচয় (identity of a person) তার জ্ঞানেন্দ্রিয় হতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিষয়।

এর পরবর্তীতে অনুসন্ধানের বিষয় হল- 'I' এবং মনের ধারণার মধ্যে কি অভিন্নতার সম্পর্ক আছে? কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এটা স্পষ্ট যে চেতনার ধারাবাহিকতার ধারণা কোনোভাবেই 'I'-এর ধারণার সাথে অভিন্ন নয়। তাছাড়া এই সবকটি বিষয়কে। ধারণাকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একমাত্র আত্মপরিচয়ের ধারণাই (notion of identity) হল স্থায়ী গুণক। কাজেই 'I'বা 'অহং' এবং 'mind' বা মন যে ভিন্ন এটা তার অন্যতম কারণ। এমন কি গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তিকালিন অবস্থায় যখন বাহ্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণে আমার দেহ বা মন কোনোটি সক্রিয় থাকে না, তখনও আমাদের আত্মপরিচয়ের ধারণা অক্ষুন্ন থাকে। তাই উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্ম পরিচয়ের নীতি (principle of identity) স্বরূপ সেই নীতির অনুসন্ধান করা হয়েছে যা দেহ এবং মন হতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র। কাজেই এটা বলা যায়, বৈদিক সাহিত্যে 'ব্রহ্মজ্ঞানার্জন' বা 'ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি'কে সকল জ্ঞানের প্রধান জ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমতে অবিদ্যার বিনাশের মধ্যদিয়ে জীব যখন ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করবে তখন তার জগৎ বিষয়ক সকল মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ হবে, এবং সে নিজের স্বরূপ- 'জীব ব্রহ্ম স্বরূপ' উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে। অর্থাৎ আত্ম পরিচয়ের অনুসন্ধানে, আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বৈদিক সাহিত্যে যে উত্তর আমরা পাই তা হল 'আমি স্বরূপত ব্রহ্ম'। অর্থাৎ স্বরূপের মানদণ্ড নির্ধারণে বৈদিক সাহিত্যে 'অধ্যাত্মবাদ' গৃহীত হয়েছে। আর তাই এখানে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা স্বরূপ আত্মাকে 'আমি' বা 'আমার স্বরূপ' বলে দাবি করা হয়েছে। যার চরম সূক্ষরূপ আমার পাই বেদান্ত দর্শনে। প্রসঙ্গত, এযাবদ্ ষড়দর্শন আলোচিত আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনায় এটা উপলব্ধি হয়- শাশ্বত আত্মতত্ত্বের প্রাথমিক সূক্ষ্ম রূপ

আমরা পাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে। এখানে 'আত্মা' দেহাতিরিক্ত, নিত্য স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্বীকৃত। তবে এখানে 'আত্মা' জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা রূপে বর্ণিত হয়েছে, যা আত্মার স্বরূপ নয়। কিন্তু যে বাক্তি 'আত্মা'কে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে প্রথম জানছে তার কাছে এই তত্ত্ব অতিব মূল্যবান। কাজেই এটি আত্মতত্ত্ব অবগতির একদম প্রাথমিক পর্যায়। পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা আমরা পাই সাংখ্য বর্ণিত আত্মতত্ত্বে। এখানে আত্মা আরো সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হয়েছে। সাংখ্য মতে আত্মা নিত্য জ্ঞানস্বরূপ; সুখ-দুঃখ আত্মার ধর্ম নয়। আত্মা জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা নয়। তবে এখানে আত্মার নানাত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বহুপুরুষবাদী সাংখ্যগণ দেহভেদে আত্মার ভিন্নতা স্বীকার করায় এমত বেদান্ত দর্শনে সমালোচিত হয়েছে। তাই এটি আত্মতত্ত্ব অবগতির দ্বিতীয় পর্যায়। অন্যভাবে বললে, সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত আত্মতত্ত্ব মধ্যমাধিকারীর অধিগম্য। উক্ত রূপে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অধিগত হলে পরমসূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব উপদেশ উপলব্ধির সুযোগ হয় এবং সেই উপদেশই রয়েছে বেদান্ত দর্শনে। এটি পরমসূক্ষ্ম উপদেশ কারণ, এখানে আত্মা তথা ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় রূপে বিবক্ষিত। যিনি নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এক শাশ্বত অপরিনামী সত্তা রূপে আলোচিত হয়েছে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বরূপত নিয়ে অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এবং 'স্বরূপ' আলোচনায় এই প্রত্যেকটি মত স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যার দাবীদার। কিন্তু আলোচনার বহর সীমিত রাখতে এখানে কেবলমাত্র উপনিষদ উল্লেখিত আখ্যান সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এই আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো আমরা পাই তা নিম্নরূপ-

১/ উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হয়েছে।
২/ এখানে দেহোত্তর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত।
৩/ এমতে আত্মা নিত্য শাশ্বত অনাদি অনন্ত সত্তা।
৪/ স্ব-রূপের জ্ঞান বলতে এখানে দেহোত্তর নিত্য শাশ্বত অনাদি অনন্ত সত্তা স্বরূপ আত্মাসত্তার জ্ঞানকে স্বীকার করা হয়েছে।
৫/ চেতনার সর্বচ্চ স্তরে যখন জীবের স্ব-রূপের জ্ঞান লাভ হয় তখন সে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।
৬/ জীব ব্রহ্ম স্বরূপ; জীব ব্রহ্মের অভিন্নতার এই যে উপলব্ধি তাকেই এখানে পারমার্থিক অর্থে 'মুক্তি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং যার এইরূপ স্ব-রূপের উপলব্ধি হয়েছে তাকে শাস্ত্রে 'মুক্ত পুরুষ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।
৭/ স্ব-রূপ জ্ঞানী ব্যক্তির স্বরূপ বর্ণনায় ভারতীয় দর্শনে দুই প্রকার মুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথা- জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি।
৮/ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির স্বরূপ বর্ণনায় শাস্ত্রে স্থীতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৯/ এখানে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে।

এখন উক্ত সিদ্ধান্তগুলির প্রেক্ষিতে যদি মূল প্রশ্নের- ঠিক কোন ক্ষেত্রে বাউলিয়া আত্মতত্ত্বে উপনিষদীয় দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করি তাহলে যে যে যে ক্ষেত্রে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার একটা বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হল।

বাউলিয়া আত্মতত্ত্বে অধ্যাত্মবাদের প্রভাব:

আত্মতত্ত্বের আলোচনায় বাউলিয়া আত্মতত্ত্বে যে যে ক্ষেত্রে উপনিষদীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল-

১/ দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা প্রতিপাদন।
২/ দেহভেদে আত্মার অভিন্নতা স্বীকার।
৩/ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা।
৪/ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা বাসনাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান।

আত্মতত্ত্বের আলোচনায় বাউল দর্শনে যে উপনিষদের প্রভাব আছে এমনটি দাবী করার অন্যতম প্রধান কারণ হল বাউল দর্শনে 'দেহ' এর ন্যায় 'আত্মা'কে স্বতন্ত্র তত্ত্ব/পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত চার্বাকী

দেহকেন্দ্রিকতাবাদে 'স্ব-রূপ' প্রসঙ্গে যে আলোচনা আমরা পাই তাতে আত্মার উৎস হিসাবে জড়কে স্বীকার করার মধ্যেই এই ধারণা সীমাবদ্ধ নয়। এখানে দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলেও দাবী করা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মা প্রসঙ্গে জড়বাদী মতাদর্শের একটি শর্ত যদি হয় জড় হতে চেতনার উৎপত্তি স্বীকার তাহলে অপর শর্তটি হল দেহ ও আত্মার অভিন্নতাবোধ। তথা দেহকেই আত্মা বলে স্বীকার করা। কিন্তু বাউলগণ কখনই দেহকে আত্মা বলে স্বীকার করেন নি। বরং অধ্যাত্মবাদের ন্যায় এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করা হয়েছে। এখানে 'আত্মা'কে দেহকার্যের নির্যাস বলে মান্যতা দেওয়া হয়নি। বরং 'আত্মা'র উৎপত্তিতে পঞ্চমতত্ত্ব হিসাবে 'নূর এ সাফা'র কথা স্বীকার করা হয়েছে। আত্মা যে দেহ কার্যের ফল নয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাঁইজী বলেন-

'সবে বলে প্রাণপাখি শুনে চুপে চেপে থাকি
জল কী হুতাসন মাটি কি পবণ কেউ বলে না বিচার করে'

এ গানের মধ্যে দিয়ে সাঁইজী আলেক সমাজের কাছে স্পষ্টতই এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন যে, জড়বাদী দর্শনে দেহকার্যের নির্যাস স্বরূপ যে চতুভূতের কথা স্বীকার করা হয়েছে তার কোনটি দ্বারা 'প্রাণপাখি' স্বরূপ 'আত্মা'র নির্মাণ তা কখনই কেউ নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এখন চার্বাকী দেহাত্মবাদের প্রেক্ষিতে কেউ এমন দাবী করতেই পারেন, একক কোনো একটি মহাভূত হতে আত্মার নির্মাণ হয় না ঠিকই কিন্তু চারটি মহাভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে যখন তাদের মিলন হয় তখন দেহ এবং দেহ কার্যের নির্যাস স্বরূপ আত্মার নির্মাণ হয়। কিন্তু বাউল যে এই ধারণায় বিশ্বাসী নয় তার প্রমাণ মেলে আবু ইসাক হোসেন রচিত বাউল দর্শন ও লালনতত্ত্ব গ্রন্থে। এখানে তিনি দেহ ও আত্মা প্রসঙ্গে বাউলের অভিমত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

> "বাউলগন বিশ্বাস করে এই দেহ আব, আতস, খাক, বাত এই চার উপদানে আজাজিল তৈরি করে। কিন্তু সেটি ছিলো অসম্পূর্ণ দেহ, অচৈতন্যদেহ। এই অসম্পূর্ণ, অচৈতন্য দেহের কোনো মূল্য ছিল না। কিন্তু পঞ্চ প্রকার ভূত হিসাবে যখন তার ভিতর আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটলো তখন দেহ চেতনা লাভ করলো এবং তা সম্পূর্ণ হলো। তাই যে আত্মার কথা আমরা বলছি তা দেহ উপাদানের ফল নয়, তা একটি স্বতন্ত্র সত্তা।"[১৮]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের ন্যায় দেহ ও আত্মার মধ্যে ভেদ করা হয়েছে, আত্মাকে দেহ হতে ভিন্ন সত্তা বলা হয়েছে। একইভাবে দেহ ও আত্মার ভেদ বর্ণনায় পার্বতী দাস বাউল তাঁর গানে বলেছেন-

'আমার বাসায় নাই যে নির্বন্ধ
আর বলবো কিভাই দেহের সনে
কেমন সম্বন্ধ' (অংশ বিশেষ)

এ গানের ভাষায় আত্মার আশ্রয় স্থল হিসাবে দেহকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা স্বরূপ বেদান্ত দর্শনে যে শম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), তিতিক্ষা (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), সমাধান (ঈশ্বরে চিত্তানিবেশ), শ্রদ্ধা (গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস) ইত্যাদি যে 'ষট্সম্পত্তি'র কথা উল্লেখ আমরা পাই তা কিন্তু বাউল দর্শনেও স্বীকার করা হয়েছে। শুধুতাই নয় বেদান্তের ন্যায় বাউল দর্শনেও আত্মার একত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় দর্শনেই দেহভেদে আত্মার অভিন্নতাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাই এই দিক থেকে আত্মদর্শনের আলোচনায় আমরা উপনিষদীয় চিন্তার সাথে বাউলের সাদৃশ্যতা পাই।

অতএব এটা স্পষ্ট, স্বরূপের আলোচনায় উপনিষদের ন্যায় এখানেও 'দেহ' ও 'আত্মা'র মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করা হয়েছে। এবং উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে সাধনার বিষয় রূপে গৃহীত হয়েছে। তবে সাদৃশ্য কেবল এতটুকুই। কারণ, উপনিষদের ন্যায় আত্মা এখানে দেহাতিরিক্ত কোনো সত্তা নয়। বাউল মতে আত্মার প্রকাশ বিকাশ সবই দেহকে ঘিরে। তাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার নিষ্প্রয়োজনীয়। আসলে স্বরূপের আলোচনায় বাউল দর্শনে আত্মাকে মানদণ্ড বলে স্বীকার করায় এই মতকে অধ্যাত্মবাদ বলে দাবী করা হয়। তবে বাউল একান্তভাবে অধ্যাত্মবাদ নয়। কারণ, উপনিষদে যে অর্থে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে তা বাউল দর্শনে অস্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে সাঁইজী তাঁর এক পদে বলছেন-

'দেখ না রে মন পুনর্জনম কোথা হতে হয়
মরে যদি ফিরে আসে স্বর্গ নরক কে বা পায়।' (অংশ বিশেষ)

বাউল দর্শনে যে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত তার প্রমাণ এই পদ। এক্ষেত্রে আপত্তি আসতে পারে- বর্তমানবাদী বাউল দর্শনে কীভাবে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদের ব্যাখ্যা সম্ভব। তাছাড়া যেখানে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত, সেখানে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদকে গ্রহণ করার তাৎপর্য কী? তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সংক্ষেপে 'জন্মান্তরবাদ' কী আলোচনা করতে হয়।

প্রসঙ্গত জন্মান্তরবাদের ভিত্তি হল কর্মবাদ। আসলে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ একে অপরের পরিপূরক। তাই একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা ব্যতীত অপর তত্ত্ব ব্যাখ্যা কার্যত অসম্ভব। উল্লেখ্য, ভারতীয় নীতিতত্ত্ব অনুসারে কর্মফল ভোগ ব্যতীত জীবের মুক্তি সম্ভব নয়। কর্ম বলতে এখানে মূলতঃ সকাম কর্ম, বা কামনা-বাসনার দ্বারা বশীভূত হয়ে সম্পাদিত কর্মের কথা বলা হয়েছে। এই মতানুসারে কামনা-বাসনাহীন সম্পাদিত কর্ম কখনো ফল উৎপাদন করেনা, তা শুষ্ক বীজের ন্যায়। কিন্তু কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে সম্পাদিত কর্মের ফল জীবকে ভোগ করতেই হয়। এক জন্মে যদি সেই ফল ভোগ সম্পূর্ণ না হয় তাহলে জীবকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কর্মফলভোগের জন্য জীব এই ভাবেই জন্ম-মৃত্যু-পুর্নজন্ম-এর ভবচক্রে আবর্তিত হয়। এবং ভবচক্রে জীবের এই আবর্তনকেই ভারতীয় শাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এবং তার ব্যাখ্যায় উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বে অনিবার্যভাবে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

প্রচলিত কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ধারণা আমরা বাউল দর্শনেও পাই। এমতে 'কর্মসূত্র' অপরিবর্তনীয়। কাজেই পূর্বজন্মের ভালো মন্দের উপর যেমন বর্তমান জীবনের ভালোমন্দ নির্ভরশীল; তেমনি এই জন্মের ভালোমন্দের উপর পরবর্তী জন্মের ভালোমন্দ নির্ভরশীল। মানুষ কোনো ভাবেই এই কর্মসূত্রকে এড়াতে পারেনা। বাউল মনে করে; কর্মসূত্রের ফল ঘটনা চক্রে মানব জীবনে অবশ্যই ঘটবে। তাই দুঃখ জনক কোনো কাজ সম্পাদন থেকে এরা সর্বদাই নিজেকে বিরত রাখতে চায়। মূলতঃ এই ধারণার কারণেই বাউলগণ সন্তান জন্মদানে অনিহা প্রকাশ করেন এবং সন্তান জন্মদান 'চৌরাশির ফ্যার' বলে মনে করেন। উল্লেখ্য দেহসাধনায় বিশ্বাসী বাউলগণ দেহমাঝে পরমসত্যের অনুসন্ধান করেন এবং এই সাধনায় সাধন সঙ্গিনী হিসাবে নারীর উপস্থিতি আবশ্যিক। ফলতঃ প্রশ্ন আসতে পারে- যে সাধনায় নর-নারীর দৈহিক সাধনা তথা মৈথুন-সাধন প্রণালী স্বীকৃত সেখানে বাউলগণ কেন সন্তান ধারনে অনিহা প্রকাশ করেন? সন্তান জন্মদানে বিরত থেকে কিভাবে এই সাধনা সম্ভব? উক্ত প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে বাউলের সাধন পন্থা 'দেহসাধনার' ইতিবিত্যান্তে।

বাউল সাধনায় নারীর উপস্থিতি তিনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যথা- মাতা, দাসী এবং সঙ্গিনী। নারী যখন বাউলের নিকট অন্নদাত্রী তখন সে জগত মাতা; যখন সে গৃহকাজে তার সহযোগী তখন সে দাসী এবং যখন সে বাউলের সাধনার সহযোগী তখন তার ভূমিকা সাধন সঙ্গিনী রূপে প্রকাশ পায়। এই ভূমিকায় অবতীর্ন নারী বাউল সাধকের কাছে 'রূপ নদী', 'চেতনা গুরু'। "চেতন গুরু কেন্দ্রিক সাধনার মধ্যদিয়েই বাউল পরমগুরুর সন্ধান পেতে চায়",[১৯] অধরাকে ধরতে চায়। তাই লালন বলেন 'চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই'। অর্থাৎ মৈথুনাত্মক যোগ সাধনার মধ্যদিয়ে পরমসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি কর। তবে এই সাধনার ফল স্বরূপ কোনোভাবেই সন্তান জন্মদান বা শরিক সৃষ্টির অনুমোদন বাউল দেয়না। তাই বাউল নিঃসন্তান, "ষোল আনা একা।"[২০]

উল্লেখ্য, আমরা জানি জৈবিক নিয়মানুযায়ি নারীর ডিম্বানু ও পুরুষের শুক্রানুর মিলনের মধ্যদিয়ে সন্তানের সৃষ্টি হয়। একে বাউল দর্শনে ক্ষীর নীর[২১] বলা হয়েছে, এটি হল মানবের মূল সত্ত্বা। লালন তাঁর গানের ভাষায় একে- 'নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাউল মতে নারী হল রসের ভান্ডার এবং নারী হতে কামরস সংগ্রহ করাকে এখানে 'মহাজনের ধন চুরি' করা বলা হয়েছে। বাউল সাধনা হল এই মহাজনের ধন চুরির সাধনা। এক্ষেত্রে তাঁরা আমানত বস্তু[২২] অটল রেখে ভবপার হতে চায়। তাই বাউল সাধনায় সন্তান জন্মদানে অনিহা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে যোনিজ সন্তানে অনাগ্রহী বাউলগণ শিষ্যদের সন্তান স্নেহে লালন-পালন করতেন। তাই বাউলের নিকট শিষ্য হল অযোনিজ সন্তান। আসলে তাঁদের মতে, আমানত বস্তুর খেয়ানত হলে সাধন ভজন অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং সন্তান সৃষ্টি হয়। ফলে সাধক আবার জন্মচক্রের ফাঁদে পড়ে। বাউল দর্শনে সন্তান সৃষ্টি মানে জন্মগ্রহণের পথ খোলা রাখা। আর জন্ম-মৃত্যু মানেই দুঃখকর কাজে অংশগ্রহণ করা। তাই লালন ফকির বলেন- 'ঝাপদিয়ে মড়লি মন বাপের

পুকুরে'। এখানে বাবার পুকুর বলতে 'স্ত্রী'-র জননেন্দ্রীয়কে বোঝান হয়েছে। সেখানে যে সন্তান সৃষ্টি করেছে সে জনন্মচক্রে পড়েছে। সে ভাবের শহরে[২৩] আটক হয়েছে। আর ভাবের শহরে আটক ব্যক্তির পক্ষে ভাবসাগর পার সম্ভব নয়। তাই লালন তার গানে বলেছেন- 'যাতে জন্ম তাতেই মলি'। আবার অন্যত্র কামের ফাঁদ হতে সাধককে সতর্ক করতে লালনের গানে 'মায়া নদী'র কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে- 'কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর তুফানে' অর্থাৎ পূর্ণবীর্যমান মানুষ কাম উত্তেজনায় আমানত বস্তুকে ক্ষয় করে অটলত্ব নাশ করে, ফলে ভবপারে যেতে পারে না। আবার আরেক জায়গায় তিনি বলেন-

'বাঁকা নদীর পিছল ঘাঁটে
পার হবি কি করে'

পারের সন্ধান কিন্তু পাটনি সাঁইজী নিজেই দিয়েছেন তাঁর গানে। একগানে তিনি বলেছেন- 'ইন্দ্রদ্বারে কপাট দেয়, সেই বটে ডুবারু হয়'। পৌরাণিক মতে দেবরাজ ইন্দ্র হলেন বারীবর্ষনকারী। মানবদেহের যে দ্বার বা ছিদ্রপথে বারী নির্গত হয় তাকে ইন্দ্রদ্বার বলে। আর বাউল মতে ইন্দ্রদ্বার হল- "শুক্র নির্গত হওয়ার দ্বার।"[২৪] কাজেই যে কাম নিয়ন্ত্রন করতে পারে সেই ভবপার হতে পারে। এখন প্রশ্ন- কাম নিয়ন্ত্রন কিভাবে সম্ভব? উত্তরে বলতে হয়, বাউল মতে রতি ক্রিয়ার সময় শুক্রের নিম্নগামী স্রোত মূলাধার চক্রের নিচে নামলে শুক্রপাত ঘটে, জীবের জন্ম হয়। জন্মকে তাঁরা আত্মার খন্ডিত রূপ বলে মনে করেন। যা বাউল সাধনায় অনস্বীকার্য। এ সাধনা আত্মার অখন্ড রূপে উপনীত হবার সাধনা। তাই বাউল নিম্নগামী শুক্রকে বায়ুতারিত করে তথা কুম্ভক সাধনা দ্বারা উর্দ্ধগামী করে। এই সাধনায় সুষুম্না নাড়ির মধ্যদিয়ে শুক্র উর্দ্ধগামী করে দ্বিদল পদ্মে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিদল পদ্মে শুক্র নিয়ে বাউল রমন সুখ বা মহাসুখ ভোগ করেন। মহাসুখের আস্বাদনকে সাঁইজী তাঁর গানের ভাষায়- 'চালাও তরী উজান ধার' বলে উল্লেখ করেছেন। এই মহাসুখ ভোগের মধ্যদিয়ে সে 'মনের মানুষের' স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, অধরাকে ধরতে পারে। সুফী-ফকির-বাউলরা একে "নফি এসবাতের জিকির"[২৫] করা বলে অভিহিত করেছেন। বাউল-ফকিরদের বিশ্বাস এই জিকির করার ফলে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে লালনের আরেকটি পদে বলা হয়েছে-

'শুদ্ধপ্রেম সাধলে যদি
কাম-রতিকে রাখলে কোথা
...
খেলছে দেখ গে তোরা'[২৬]

এই পদে সাঁইজী বলতে চেয়েছেন- হরি, কৃষ্ণ, আল্লাহ বলে চিৎকার করে কিংবা মনের মানুষের সন্ধানে ব্যকুল হয়ে তাকে পাওয়া যায় না। সত্যি যদি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। যদি মনের মানুষকে ধরতে হয়, আপনাকে চিনতে হয়; তাহলে তার জন্য কর্মময় যোগসাধনা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ, হরি, কৃষ্ণ- সে যে আমার মধ্যেই আছে, তাই নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই তাকে জানা যাবে। আর এই উপলব্ধির জন্য কামের মধ্যদিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং প্রকৃতি সেবা করতে হবে। তাই বাউল সাধনায় নারী হলেন মহাশক্তিরূপিনী, রসময়ী, প্রেমসত্তা। আর এই সাধনা হল 'সহজ সাধনা'। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে বলেছেন-

> "সৃষ্টির মূলতত্ত্ব রজঃ বীজের ধারা উদ্ধদিকে উল্টাইয়া যাইবে এবং চরম অবস্থায় উভয় চেতনা মিশিয়া গিয়া, আত্মস্বরূপের সামরস্য সংঘটিত হইয়া পরমানন্দ উপলব্ধি হইবে। এই প্রেম যত গভীর হইবে সাধক ততই জ্যান্তে মরা অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত ও চেতনাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। একান্ত দেহগত আকর্ষণ অর্থাৎ কাম দমিত হইবে এবং শেষে আত্ম স্বাক্ষাৎকার বা মনের মানুষের উপলব্ধি হবে, ইহাই বাউলের প্রেম সাধনা।"[২৭]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট, বাউল দর্শনে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ আলোচিত হলেও তা উপনিষদীয় প্রেক্ষিত থেকে নয়, বরং তা নিজ দর্শনগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে। উপনিষদে দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণার উপর ভিত্তি করে জন্ম-মৃত্যু-পুর্নজন্ম- এই ভব চক্রের মধ্যদিয়ে জন্মান্তরবাদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দেহাতিরিক্ত আত্মার অভাব বশতঃ বাউল দর্শনে 'পুনর্জনম' বলতে আত্মার নব দেহ ধারণকে নয়, বরং সন্তান জন্মদান স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'সন্তান জন্মদান' অর্থে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয়েছে। সন্তান জন্মদানের মধ্যদিয়ে সাধক দেহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং মনের মানুষ তার কাছে অধরা থেকে যায়। মূলতঃ এই কারণেই বাউলগণ সন্তান

জন্মদানে অনিহা প্রকাশ করেন। কাজেই এটা বলতেই হয়, 'স্ব-রূপ'এর আলোচনায় বাউলের সাথে উপনিষদীয় সিদ্ধান্তের সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হলেও বাউলকে এককভাবে অধ্যাত্মবাদী বলা যায় না। আসলে বাউলকে এককভাবে জড়বাদ বা অধ্যাত্মবাদ কোনো সম্প্রদায় ভূক্ত করা যায় না। কারণ স্বরূপের সন্ধানে বাউল সাধনায় দেহ অপরিহার্য হলেও বাউল সাধনা দেহবাদী নয়। এখানে দেহ অবলম্বনে দেহ মাঝে পরমসত্তার সন্ধান করা হয়েছে। ফলতঃ আত্মদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনায় বাউল না বস্তুবাদী না অধ্যাত্মবাদী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত। প্রসঙ্গত, তত্ত্বগত ভাবনায় সকল সম্প্রদায়ই স্বরূপের সন্ধানে ব্রত। ব্যতিক্রম বাউলের ক্ষেত্রেও হয় নি। বাউলের গানের ভাষাতেও আমরা পরমসত্তার সন্ধানে তার আত্মব্যকুলতার সন্ধান পাই। স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারার যে আত্মিক আর্তনাদ তা ঝঙ্কারিত হয়েছে বহু বাউল গানে। তাই এ বিচারে বাউল দ্বারা সৃষ্ট গানগুলি কেবল গান নয় বরং তা হল স্বরূপের অনুসন্ধান। যে অনুসন্ধানকে কেন্দ্রকরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্তাকেন্দ্রিক বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব। কিন্তু ভিন্নতা হল বাউলের স্বীকৃত পন্থায়। বাউল ব্যতীত সকল সম্প্রদায় যেখানে স্বরূপের অনুসন্ধানে, পরমসত্তার সন্ধানে, জীবাত্মার-পরমাত্মার মিলনে হয় বস্তুবাদী না হয় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অনুসন্ধানে ব্রত হয়েছে, সেখানে বাউলগণ কোন একপাক্ষিক পথে না হেঁটে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন। স্বরূপের বর্ণনায় তাঁরা না দেহকে স্বরূপ বলে মান্যতা দিয়েছে, আর না দেহতিরিক্ত সত্তার অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে পরমসত্তার সন্ধান করেছেন। বরং এখানে দেহ মাঝে আপনার 'আমি'কে খোঁজা হয়েছে। অন্যভাবে বললে বর্তমানবাদী বাউল মতাদর্শে যেহেতু সসীমের মাঝে অসীমের সন্ধান করা হয়েছে, সেহেতু দেহকে বর্জন করে নয় বরং দেহকে অবলম্বন করেই পরমসত্তার সন্ধান করা হয়েছে। এখানে দেহকে 'রূপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং রূপের গভীরে 'স্বরূপ'-এর অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাউল গবেষক ডক্টর আনোয়ারুল করীম মহাশয়ের অভিমত হল- দেহ এবং আত্মা দুইই সাধনার বিষয়। বাউল বিশ্বাস করে যে একটিকে অস্বীকার করে অপরটি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। এই সাধনা তাই বস্তুজীবনকে যেমন অস্বীকার করেনি তেমনি অস্বীকার করেনি অধ্যাত্মচেতনাকে। মানুষের দেহে যে আত্মার অবস্থিতি তার স্বরূপকে জানার মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের মাধ্যমে পরমার্থকে জানা এই অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য।[২৮]

বাউল স্বীকৃত আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে করীম সাহেবের এই অভিমত হতে এটা অনুমান করা যায়; আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গে বাউলের প্রাথমিক শর্ত হল; 'নিজেকে জানা'। এমতে 'আপনার আমির' সন্ধান ব্যতীত কখনই পরমসত্তার সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। কারণ দেহাতীত যে অচিন মানুষের সন্ধানে বাউলগণ সদা নিমজ্জিত তার আশ্রয় স্থল হল দেলমক্কা। তাই দেলমক্কার ভেদ বিহীন আপন সত্তার অন্তরে চাপা পরে থাকা অজানা মানুষের জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। আত্মদর্শন প্রসঙ্গে এই একই দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ আমরা পাই বাউলের দেহতত্ত্ব গ্রন্থে। এই গ্রন্থের গ্রন্থাকার জনসন সন্দিপ মহাশয়ের বক্তব্য হল- "বাউল ফকিরেরা দেহ বিহীন আত্মা/ সভা/ চৈতন্য বা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। সূক্ষ্ম আলোচনার মত 'নূর'। বীজ থেকে নূর/ বীজ থেকে নীর/ আকার সৃষ্টি হয় (নীরাকার নির্গত আকার), তা থেকে মাটি ক্রমে দেহাদি। অতি সূক্ষ্ম দেহ বিকাশিত হয়ে স্কুল দেহে পরিনত হয়। রজঃ এবং বীজের সূক্ষ্ম কণা দেহ গঠন করে। দেহের মধ্যে আছে অনন্ত ভুবন, তাবৎ ব্রহ্মান্ড, নদ-নদী, ভুভুবঃ স্ব। এমনকী স্বয়ং স্রষ্টা গাছের বীজের মতো, জলে মাছের মতো এ দেহেই লুকিয়ে থাকেন। দেহের তত্ত্ব জেনে নিজের দেহের মধ্যেই যা সাঁই নিরলুকনকে ধরা। বাইরে অনলে অনিলে শূণ্য তিনি নেই। সাধক তা নিজ দেহে মনোনিবেশ করেন। আত্মস্বরূপ সন্ধান করেন স্রষ্টাকে।"[২৯]

এখন বাউল স্বীকৃত আত্মপরিচয় সম্বন্ধে এই দুই গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনায় এটা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাউল আত্মদর্শন হল প্রত্যক্ষ অবলম্বনে অপ্রত্যক্ষিত সত্তার জ্ঞান আরোহনের সাধনা। এই অপ্রত্যক্ষিত সত্তাকেই তাঁরা 'মনের মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন তাঁদের গানে। বাউল গানের ভাষাকে পর্যালোচনা করলেই এটা বোঝা যায় যে এই সাধনার লক্ষ্য হল দেহ মধ্যে মনের মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি এবং অন্তপর তার সাথে একাত্ম হওয়ার মধ্যদিয়ে দেহ অভ্যন্তরে থাকা মূল সত্তার স্বরূপ জ্ঞান অর্জন করা। অতএব এখন যদি পূর্ব উল্লেখিত প্রশ্ন- ঠিক কোন ক্ষেত্রে বাউল দর্শনে উপনিষদীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? তার উত্তর অনুসন্ধান করি, তাহলে উত্তর স্বরূপ বলা যায়- ব্যক্তির স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনায় বাউলের মত- এককভাবে দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদ বা অধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি কে? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান কখনই সম্ভব নয়। কারণ, কারণ বাউল দর্শনে ব্যক্তি জীবনের দুইটি দিক স্বীকৃত হয়েছে, যথা- জাগতিক দিক এবং অধ্যাত্মিক দিক। ইন্দ্রিয়জ কামনা বাসনার পূর্ণতা বা দৈহিক সুখলাভের যে প্রচেষ্টা ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা হল ব্যক্তির জাগতিক দিক। ব্যক্তির স্বরূপ অন্বেষণে এই জাগতিক দিক অবশ্য

বিচার্য বিষয় হলেও তা একমাত্র দিক নয়। ব্যক্তি কেবল জাগতিক চাহিদা পূরণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। জাগতিক চাহিদার পাশাপাশি ব্যক্তির আছে এক অলঙ্ঘনীয় আধ্যাত্মিক চাহিদা। সে সৃষ্টির মূল কারণকে জানতে চায়। স্রষ্টাকে জানতে চায়। পরমসত্তার সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। কিন্তু এ চাহিদার কোনো স্বীকৃতি দেহ-কেন্দ্রিকতবাদে নেই। তাই আধ্যাত্মিক চাহিদার পরতৃপ্তিতার জন্য স্ব-রূপের আলোচনায় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেও গ্রহণ করতে হয়। তবে তা এককভাবে নয়। এককভাবে অধ্যাত্মবাদ কিংবা দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদ অস্বীকার করার কারণ স্বরূপ এখানে বলা হয়েছে, দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদ যখন জড় হতে চেতনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে, কিংবা দেহকে ব্যক্তির স্বরূপ বলে অভিহিত করে, তখন তাদের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অন্তর্নিহিত সারসত্তাকে বাদ দিয়ে কেবল বাহ্যিক আবরণের কথাই প্রচার পায়। অনুরুপভাবে অধ্যাত্মবাদ যখন দাবী করে জগতের আদি কারণ হল চেতনা, তখন একইভাবে অধ্যাত্মবাদেও সত্তার স্বরূপের কেবল কঙ্কালটিকেই তুলে ধরা হয়; তার মূল নির্যাসটিকে নয়। তাই শেষ বিচারে দুইটি মতবাদই এক পাক্ষিক। আর তাই এখানে ব্যক্তির স্বরূপ বর্ণনায় এক পাক্ষিক দৃষ্টির পরিবর্তে এক প্রকার মধ্যমপন্থা বা সমন্বয়বাদী দৃষ্টি গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বাউল মতে অধ্যাত্মবাদ ও দেহকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তা যতটা না তাত্ত্বিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক, কেননা মানুষ কেবল যেমন জড় দিয়ে গঠিত নয়, তেমনি এককভাবে তাকে চেতনা দিয়ে গঠিত বলেও দাবী করা যায় না। জড় ও চেতনা এই দুইয়ের সমন্বয়েই তার সত্তা গঠিত। তাই একটিকে বাদদিয়ে বা উপেক্ষা করে অপরটিকে আকরে ধরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই এই দাবী অমূলক নয় যে, স্ব-রূপের আলোচনায় বাউল দর্শনে এককভাবে অধ্যাত্মবাদকে গ্রহণ করার পরিবর্তে দেহসম্পৃক্ত আত্মাকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। অন্যভাবে বললে, বৈদিক সাহিত্যের ন্যায় বাউলিয়া আত্মতত্ত্বেও পরমাত্মা বাক ও মনের অগোচর নিরাকার, নিরবয়ব এক শুদ্ধসত্তা রূপে স্বীকৃত। কিন্তু ভিন্নতা হল উপনিষদীয় তত্ত্বে যেখানে মুক্তি বলতে কেবলই শুদ্ধ সত্তার জ্ঞান বা উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে, সেখানে বাউলের অনুসন্ধানের লক্ষ্য কিন্তু কেবল এই শুদ্ধ সত্তার স্বরূপের অনুসন্ধান নয়। বরং এখানে অনুসন্ধানের লক্ষ্য আদিকামনা 'এক আমি বহু হবো' প্রকাশক সত্তার অনুসন্ধানকে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ এই কামনা জন্যই জীবের সৃষ্টি, বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি। এই বিচারে আমরা সবাই কামজাত উদ্ভূত সত্তা। আর তাই বাউলগণ তাদের গানের ভাষায় সর্বদাই এই কামীর সন্ধান করে ফেরেন। এবং তা করতে গিয়েই এখানে দেহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, দেহভান্ডের কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাদের অভিমত হলো- আমার দেহ নিরপেক্ষ তাঁর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে কী নেই তা আমার জানা নেই, কিন্তু একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে, সে আমার ভিতরে আছে। আমার মধ্যদিয়েই সে প্রকাশ পায়। তাই 'আমি' ছাড়া বাইরের কিছু আছে কি না তা আমি না জানলেও! 'আনার ভেতর' যে তিনি আছেন তা আমরা জানি। আর আমার ভেতরে তিনি আছেন বলেই 'আমি' হলাম 'তিনি'। লক্ষণীয় বাউল যখন বলে 'আমিই তিনি' কিংবা বেদান্ত যখন বলে 'জীব ব্রহ্মস্বরূপ' তখন উভয় বাক্যের বাচ্যার্থ অভিন্ন। তবে বাক্যগুলি অভিন্ন অর্থের বোধক হলেও ধারণাগত দিকদিয়ে এই দুইটি মতাদর্শের মধ্যে ভিন্নতা আছে। বৈদিক সাহিত্যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান হিসাবে মানব দেহকে স্বীকার করা হলেও পরমাত্মার অধিষ্ঠান হিসাবে মানব দেহ গৃহীত নয়। তাই বৈদিক সাহিত্য বর্ণিত জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা ইহজাগতিক নয়, পক্ষান্তরে বাউল যখন বলে 'আমিই তিনি', তখন তার ভিত্তি ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি কারণ, বাউল আপন দেহ মাঝে কেবল জীবাত্মার নয়, পরমাত্মার অধিষ্ঠানও স্বীকার করেছেন। তাই জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন বর্ণনায়, জীবের স্বরূপ বর্ণনায় বাউলিয়া আত্মতত্ত্বে যে আলোচনা আমরা পাই তা প্রথাগত বা ধ্রুপদী অধ্যাত্মবাদী চর্চা নয়। বরং তা প্রথাগত অধ্যাত্মবাদ হতে একটু ভিন্ন। আসলে ধ্রুপদী অধ্যাত্মবাদী তত্ত্বে বাইরের সত্যকে পরম সত্য বলে ধরে নিয়ে দেহমাঝে তার স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু বাউলিয়া অধ্যাত্মবাদে দেহাভ্যন্তরেই পরমসত্যের সন্ধান করা হয়েছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, দেহকেই এখানে আত্মা বলে দাবী করা হয়েছে। এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে স্পষ্টভেদ করা হয়েছে; তবে এই ভিন্নতাও আবার অধ্যাত্মবাদের ন্যায় নয়। এখানে বৈদিক সিদ্ধান্ত 'সো অহম্' এর পরিবর্তে 'অহং সো' বলে মনে করা হয়েছে। যা আসলে তন্ত্রের প্রভাব বশত।

অতএব এই আলোচনার মধ্যদিয়ে আত্মদর্শন প্রসঙ্গে বাউলের অবস্থান সম্পর্কে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'ব্যক্তিক অভিন্নতার' আলোচনায় বাউলিয়া আত্মতত্ত্বে কোনো একক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়নি। আরো স্পষ্টভাবে বললে, স্বরূপের আলোচনায় এখানে এককভাবে যেমন জড়বাদ স্বীকৃত দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদ স্বীকৃত হয়নি, তেমনি আবার উপনিষদ উল্লেখিত আত্মা-কেন্দ্রিকতাবাদকেও মান্যতা দেওয়া হয়নি। আদতে বাউলগণ হলেন *লৌকিক*

অধ্যাত্মবাদের প্রচারক। আর তাই 'স্ব-রূপ'এর আলোচনায় এখানে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলিত রূপ হিসাবে দেহকেন্দ্রিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে। এখানে 'যারে দেখিনা নয়নে তারে ভজিব কেমনে'-এই বস্তুবাদী ধারণা গ্রহণ করেও বস্তুবাদের উর্দ্ধে উঠে রূপের অন্তরালে থাকা স্বরূপের ধারণাকে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের ধারণা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে বেদের 'আত্মনং বিদ্ধি' বা সক্রেটিসের 'know thyself'র অনুরুপ দাবী করে বলা হয়েছে 'নিজেকে জানলে পরমকে জানা যায়'। কাজেই আলোচনার শুরুতে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল, শেষে এসে তার উত্তর স্বরূপ আমরা এটা দাবী করতে পরি- বাউল মতে 'এককভাবে দেহ' 'অহম' পদের বাচ্যর্থ নয়। এখানে 'দেহ' ও 'আত্মা'র মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। তবে দেহাতিরিক্ত আত্মার কোনো অস্তিত্ব বাউল দর্শনে স্বীকৃত নয়। আর দেহাতিরিক্ত আত্মার অভাব বশত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে, চেতনার আধাররূপ কোনো অধ্যাত্মদ্রব্য 'আমার স্বরূপ' নয়। অর্থাৎ স্বরূপের আলোচনায় সহজ সাধনায় বিশ্বাসী বাউলের অভিমত হল- যদিও 'আমি' 'দেহ স্বরূপ' নয় ঠিকই, কিন্তু দেহজ্ঞানকে উপেক্ষা করেও 'আমার স্বরূপ' উপলব্ধি যোগ্য নয়। কারণ দেহ মধ্যস্থ যে 'নিরাকার আত্মা' আছে, তাকে জানবার একমাত্র মাধ্যম হল 'সাকার দেহ'। তাই স্বরূপের আলোচনায় দেহজ্ঞান আবশ্যিক। অতএব এক্ষেত্রে বাউলের সিদ্ধান্ত হল 'দেহ' হল আমার 'রূপ' এবং দেহমধ্যস্থ চেতনা হল 'আমার স্বরূপ'। আর রূপহীন স্বরূপের জ্ঞান যেহেতু নিরর্থক, তাই 'আমি' না 'এককভাবে দেহ'; আর না 'আমি' 'দেহাতিরিক্ত আত্মা'। বরং 'দেহসম্পৃক্ত আত্মা'ই হল 'আমার স্বরূপ'। অর্থাৎ 'আমি' বলতে এখানে 'দেহসম্পৃক্ত আত্মা'র কথা বলা হয়েছে; আর এই দেহসম্পৃক্ত আত্ম'র সাক্ষাৎ উপলব্ধিকেই বাউলগণ 'আত্মদর্শন' বলেছেন। আর তা করতে গিয়েই এখানে লৌকিক অধ্যাত্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের গানের ভাষায়। তাই বাউল গান অবসর কালিন বিনোদনের মাধ্যম নয়; আদতে তা হল দার্শনিক সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফকির লালন সাঁই রচিত কালজয়ী সঙ্গীত 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' গানটির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এই গানের ভাষায় সাঁইজি 'খাঁচা' পদের দ্বারা 'দেহ' এবং 'আত্মা'র আদিবিদ্যক রূপক হিসাবে 'অচিন পাখি' পদের ব্যবহার করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. Harper, Douglas. self-breath Atman Etymology Dictionary. Etymonline https://www.etymonline.com/word/atman। প্রবেশ তারিখ: ৫ই জুলাই ২০২৫
২. তদেব, পৃ: ৩।
৩. তদেব, পৃ: ৩।
৪. তদেব, পৃ: ৩।
৫. তদেব, পৃ: ৩।
৬. তদেব, পৃ: ৩।
৭. তদেব, পৃ: ৩।
৮. তদেব, পৃ: ৩।
৯. 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি' ৬/১/৩, স্বামী গম্ভীরানন্দ। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয়ভাগ ছান্দোগ্যোপনিষদ। উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ, ২৫ তম পূর্ণমুদ্রণ, এপিল ২০১৯, কলকাতা, পৃ: ৩০৫।
১০. তদেব, পৃ: ৩১৫।
১১. 'যথা সৌম্যেকেন লোহমনিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং লোহ মিত্যেব সত্যম।। ৬/১/৫, তদেব, পৃ: ৩২০।
১২. 'স য এষোহনি মৈতদাত্মামিদং সর্বং তৎ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।।' তদেব, পৃ: ৩২১।
১৩. তদেব, পৃ: ৩৩৭।
১৪. তদেব, পৃ: ৩৩৮।
১৫. তদেব, পৃ: ৩৪০।

১৬. তদেব, পৃ: ৩৪৫।
১৭. 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্হাতি নরোহ পরাণি। তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণানন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।২২।।'... শ্রীমদ্ভগবদগীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ নং শ্লোক।
১৮. হোসেন,আবু ইসাক। বাউল দর্শন ও লালনতত্ত্ব। প্রচলন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬,ঢাকা, পৃ: ১০৫।
১৯. মিঞা, ড. মোঃ আবদুল করিম। বাউল লালন পরিভাষা। নবযুগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ: ১৯।
২০. 'ষোল আনা বলতে এখানে শুক্র কে অটল রাখার কথা বলা হয়েছে' মিঞা, তদেব, পৃ: ১৫০।
২১. 'ক্ষীর অর্থ নির্যাস। বাউলগন ক্ষীর বলতে শুক্রকে বোঝায়। ক্ষীর পিতৃশক্তির প্রতীক। নারীর নীর ও পুরুষের ক্ষীর উভয় শক্তির রূপই মানবের মূলসত্তা' তদেব, পৃ: ৪১।
২২. বাউল দর্শনে আমানত বস্তু বলতে মহাজনের পুঁজিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে মহাজন হলেন ঈশ্বর, আল্লাহ তথা পরমসত্তা। এই মতে মানব দেহ ১৮টি বিষয় দ্বারা গটিত। যার মধ্যে পিতার হল ৪টি, মাতার হল ৪টি এবং পরমসত্তার হল ১০টি, যথা- পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। 'পরমসত্তার ১০টি উপাদানকে মহাজনের পুঁজি বলে' তদেব, পৃ: ১১৭।
২৩. 'ভাবের শহর বলতে সাংসারিক ও ধনসম্পদ বেষ্টিত সংসার তথা মোহের সংসার কে বোঝায়' ডঃ তদেব, পৃ: ৭৩।
২৪. তদেব, পৃ: ২৯।
২৫. 'লা ইলাহা' বলে শ্বাস গ্রহণ এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলে শ্বাস ত্যাগ করাকেই 'নফি এসবাতের জিকির' বলে' তদেব, পৃ: ১৩০।
২৬. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ। 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'। Internet Archive, https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.354955। প্রবেশ তারিখ: ২০ জুন ২০২৫, পৃ: ৮৩।
২৭. তদেব, পৃ: ৮৯।
২৮. করীম, ডক্টর আনোয়ারুল। বাংলাদেশের বাউল। জসিম উদ্দিন, ২০১৭, ঢাকা, পৃ: ৩৫।
২৯. সন্দীপ,জনসন। বাউলের দেহতত্ত্ব। তবু প্রয়াস, প্রথম প্রকাশ, ২০২১,কলকাতা, পৃ: ১৭।